Vol. 18 | No. 1 | 1974

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপ ও তাঁর কালের যাত্রা

Volume	18
Issue	1
Year	1974
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু জাফর
Published online	June 1, 1974
DOI	10.62328/sp.v18i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v18i1.2
Pages	14-29
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপ ও তাঁর কালের যাত্রা

আবু জাফর

রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী চিন্তা ও চেতনার ফাঁকে ফাঁকে উদার ও প্রসন্ন-মানবিকতার দ্যুতিময় যে ঝলক,রোগ-শোক-জর্জরিত বুভুক্ষু মানুষের জন্য তাঁর যে অকৃপণ বেদনাবোধ, ধনগর্বিত সমাজের ভয়াল পরিণতি সম্বন্ধে তাঁর যে উচ্চকণ্ঠ তা নিশ্চিতই তাঁকে সর্বহারাদের কাছাকাছি নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাঁর কবি-শক্তির অক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা এইখানেই যে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাববাদী চেতনা থেকেই শেষ-মুক্তি খুঁজতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ মানব-দরদী কবি। তাঁর কাব্যে মানব-প্রেমের ভাবটুকু রোমান্টিক-মিস্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ১৮৯৪ সালের (কবির বয়স তখন তেত্রিশ বছর) লেখা "এবার ফিরাও মোরে"র মত প্রখ্যাত কবিতায় 'মূঢ়ম্লান মূক মুখে' হাসি ফোটাবার জন্য, নিরন্ন নিঃসহায়দের মনে আশা জাগাবার জন্য তাঁদের সবাইকে একতাবদ্ধ করার জন্য এক হয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদের একতাবদ্ধ চেতনার প্রতি কবি আস্থা না রাখতে পেরে কিংবা তাঁর স্বভাবসুলভ অনুপ্রেরণায় মহাপুরুষদের বা অতিমানুষদের প্রদর্শিত ত্যাগ ও তিতিক্ষার পথ ধরে 'দুঃখহীন নিকেতনে মহিমালক্ষ্মী'র কাছে পেঁৗছবার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন। যে-সব মানুষের 'ম্লান মুখে লেখা শতাব্দীর করুণ কাহিনী' এবং যাদের জন্য মানবদরদী কবি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।

শোষিত মানুষের সেই অপরিমেয় দুঃখের ভার, তাদের 'সর্বদুঃখ-গ্লানি'র বোঝা শেষ-পর্যন্ত লাঘব হলো মহিমালক্ষ্মীর 'করপদ্মপরশনে'। আফ্রিকার জুলুর যুদ্ধে বৃটিশ

সরকারের যথেচ্ছাচারিতা তাঁকে এই বিখ্যাত কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো।[১] কিয়ৎ-কালের নিমিত্তে হলেও তিনি প্রথম ঘনীভূত আবেগে এই কবিতায় অনাহারক্লিষ্ট ও অত্যাচারিত মানুষের কাছাকাছি নেমে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভাববাদী চিন্তাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে।

এরপর ১৯১০ সালে (কবির বয়স ঊনপঞ্চাশ বছর) লেখা গীতাঞ্জলির ১১৯ সংখ্যক কবিতায় তাঁর উপলব্ধির পট পরিবর্তন রীতিমত বিস্ময়কর। যুগ যুগ প্রবাহিত ধর্মের ও তার সাধন-ভজন-পূজনের অন্তঃসার শূন্যতাকে এবং নিপীড়িত মানুষের কর্মের সঙ্গে তাঁর ঈশ্বর-উপলব্ধির সম্বন্ধ-বিচারকে মানবপ্রেমের তুঙ্গতম নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করা শ্রেয় বলে মনে করি :

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রজলে আছেন সবার সাথে
ধুলো তাঁহার লেগেছে দুই হাতে
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধুলার 'পরে।

১৯১০সালের বাংলা ও বাঙালী সমাজ জীবনের উৎকট রক্ষণশীল চেতনার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গিয়ে উপরোক্ত কাব্য-কথাকে নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক বলা চলে। দেবালয় মন্দির থেকে ঈশ্বরকে টেনে এনে ঘর্মাক্ত কৃষক-শ্রমিকের কর্মের সহায়ক হিসাবে দাঁড় করানো— কিংবা কৃষক-শ্রমিকের কর্মময় পরিবেশের মধ্যেই ঈশ্বর-উপলব্ধির যে আন্তরিক প্রচেষ্টা তাতে নির্যাতিত মানবাত্মার মহত্ত্ব যেমন একদিকে স্বীকৃত তেমনি অন্যদিকে কৃষক-শ্রমিকের শোষিত জীবনের ন্যায্য অধিকার অকুণ্ঠিত-ঔদার্যে মেনে নেওয়ার প্রবণতাও লক্ষ্যযোগ্য। প্রচণ্ড মহিমায় মণ্ডিত হয়ে যে ঈশ্বর যুগ-যুগান্তরের ধারা বেয়ে বৃহত্তর জনগণের অশুচি-সংস্পর্শকে এতকাল এড়িয়ে পবিত্র মন্দিরে সগৌরবে ঠাঁই করে নিয়েছেন, একান্ত সংগোপনে তাঁকে আরাধনা করার চাইতে কঠিনতম কর্মে নিযুক্ত ও রৌদ্রজলে সিক্ত ঐসব অস্পৃশ্য মানুষের ভিড়ের মধ্যে সেই ঈশ্বরকে একীভূত করার মধ্যেই যে মানবিক সাধনার সর্বোত্তম ফল নিহিত এহেন উপলব্ধি রবীন্দ্র-কাব্যের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এই একটি কবিতাতেই নির্দ্বন্দ্ব-চেতনায় প্রকটিত।

বৈচিত্র্য-পিপাসু কবি ভবের ঘাটে ঘাটে তাঁর ভাব-তরণী ভাসিয়ে সেখান থেকে এক-সময় সরে গিয়ে বিশ্ব-সৌন্দর্যের লীলাময় সত্তার সঙ্গে নিজেকে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

১৯৩০ সালে (কবির বয়স তখন ঊনসত্তর বছর) রাশিয়া ভ্রমণের সুফল তাঁর সাহিত্যে ব্যাপকতর ঔজ্জ্বল্যে স্থায়ী না হলেও ১৯৩১ সালে রচিত কিছু কিছু কবিতায় মানবদরদী চেতনা পরিস্ফুট। কিন্তু ১৯৩২ সালে (তাঁর বয়স তখন একাত্তর বছর) রচিত 'কালের যাত্রা'র—"রথের রশি" নাটিকাতেই রবীন্দ্রনাথ নিপীড়িত জনগণের প্রসঙ্গটিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বে, সর্বাধিক নিবিষ্টতায় গতিময় কালের প্রেক্ষাপটে যুক্তির উদ্ভাসিত আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বলা চলে এই একটি নাটকেই তিনি শোষিত জনগণের বিজয়কে স্বাগত জানিয়েছেন উষ্ণ-আন্তরিকতায়।

॥ দুই ॥

কালের যাত্রার 'রথের রশি' নাটিকার মোটামুটি একটা খসড়া ১৯২৩ সালে (কবির বয়স তখন বাষট্টি বছর) তৈরী করেছিলেন তাঁর ছাত্র শ্রীমান প্রমথ বিশীর কোন রচনার সাহায্য নিয়ে। সেটির নাম দিয়েছিলেন 'রথযাত্রা'। 'রথের রশি' নাটিকা ঐ রচনারই পরিবর্দ্ধিত ও পুনর্লিখিত রূপ।২ 'রথের রশি' নাটিকা লেখার দু'বছর আগে অর্থাৎ ১৯৩০ সালে তাঁর রাশিয়া পরিভ্রমণ এবং তাঁর মনোলোকে তার বিপুল প্রতিক্রিয়া ও ভাবস্পন্দনের স্বরূপ জানলে নাটিকাটির ভাবগত অর্থ অনুধাবন করা সহজ হবে। রাশিয়া পরিভ্রমণের পর তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে 'রাশিয়ার চিঠি' এই নামে একটি পত্র-সাহিত্য প্রকাশ করেন।৩ 'দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জনার দুর্গম পথে' যাত্রাশুরু ক'রে অশিক্ষা ও নানা কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর সরিয়ে মাত্র তেরো বছরে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে রাশিয়ার বিপ্লবী নেতারা যে বিপুল উন্নতি ঘটিয়েছেন তা দেখে রবীন্দ্রনাথ হতভম্ব হয়ে গেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই তাই তাঁকে বলতে শুনি—

"রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্যকোন দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।"

"চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশী, তারাই বাহন ; তাদের মানুষ হবার সময় নেই ; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে ; সকলের

চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবন-যাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ-সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। সভ্যতার পিলসুজ—মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"৪

রবীন্দ্রনাথের উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভিক-বক্তব্যে দুঃস্থ মানবতার জন্য সুস্থ জীবনের যে আর্তি তা অতিশয় তীক্ষ্ণ-ভঙ্গিতে অভিব্যক্ত। 'রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ' থেকে রাশিয়ায় গিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হলেন ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব দেখে। চাষাভুষো সকলকেই সমান আত্মমর্যাদায় দাঁড়াতে দেখে তিনি বারবার হতবাক হয়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মমূঢ়তা রাশিয়ার সাধারণ মানুষের পৌরুষকে যেভাবে জীর্ণ করেছিলো তাতে কোনদিন তারা আবার আত্মমর্যাদার ধ্বজা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে, কোনদিন তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনে শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ জাগরণ ঘটবে এবং তাদের সম্মিলিত কর্মশক্তিতে সমগ্র জাতির ললাটে বিজয়চিহ্ন উৎকীর্ণ হবে এমন প্রত্যাশা মানববুদ্ধিরও অগম্য ছিলো। তাই রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের সমুন্নতি দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলেছেন, (রাশিয়াতে না এলে এ জন্মের তীর্থ-দর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত"।৫ তাঁর এই তীর্থ-দর্শনের আদর্শগত ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে কালের যাত্রার 'রথের রশি' নাটিকাতে। তেত্রিশ বছর বয়সে রচিত কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে'র মধ্যে মানবদরদের স্ফুলিঙ্গ এবং ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে রচিত গীতাঞ্জলির ১১৯ সংখ্যক কবিতায় নিপীড়িত মানুষের জন্য যে সহমর্মিতা—কবির সত্তর বছর বয়সে রচিত পত্র-সাহিত্য 'রাশিয়ার চিঠি'তে এবং একাত্তর বছর বয়সে রচিত নাটিকা কালের যাত্রার—'রথের রশি'তে তারই প্রমিত-প্রত্যয় দীপ্ত-চেতনায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। এই নাটিকা রচনার পরও নয় বছর রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন এবং এই সময়-সীমার মধ্যে বেশ পরিণত কাব্য ও উন্নত মানের উপন্যাস—নাটক তিনি রচনা করেছেন কিন্তু তার কোন একটিতেও 'সবচেয়ে কম খেয়ে, থম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা' যারা করে তাদের কথা লেখেননি।৬

॥ তিন ॥

'রথের রশি' নাটিকার মূল বক্তব্য কবির ভাষায় বলতে গেলে এইরূপ :

"রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে

যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে তাই চলছে না রথ। এই অসম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অপমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে ; তাদেরই অসম্মান ঘুচলে তবেই অসম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

রূপকাশ্রয়ী এই নাটিকায় তিনি আবহমানকালের ভারতীয় বর্ণাশ্রমিক জীবনের নিবিড় বন্ধনে গ্রথিত একটি ছকের চিত্ররূপ তুলে ধরেছেন। সেই ছকের মধ্যে গর্বোদ্ধত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এতকাল ধরে একে একে সমাজের নীচু তলায় অবস্থিত শূদ্রের উপরে তাদের দোর্দণ্ড প্রতিপত্তি ও নিষ্ঠুর আচরণের প্রকাশ ঘটিয়েছে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় একসময় ব্রাহ্মণরাই আধিপত্য করেছে, সমাজের সকলকে পদানত করেছে। সে ক্ষমতা গেল পুরোহিতের হাতে। কালের রথকে তারাই টেনে নিয়েছে কিন্তু একসময় ক্ষত্রিয়রা শাসনের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলো। কালের রথের রশি তারাই অনেককাল পর্যন্ত টেনেছে। কিন্তু কালের যাত্রায় অবার ছন্দঃপতন হলো। বৈশ্য তথা ধনিকশ্রেণীর আধিপত্য শুরু হলো। তারাই পেলো কালের রথ চালাবার পরিপূর্ণ ক্ষমতা। শাসনের এবং শোষণের উচ্চণ্ড অভীপ্সা এবং অপরিমেয় লোভের মাত্রা একসময় এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পেঁছালো যখন কালের রথকে টেনে নেওয়া আর সম্ভব নয়। রথ নিশ্চল, রথের রশি অটল। ওদের টানে রথ আর চলবে না। তাই কালের নিয়মে রথের রশি ধরবার জন্য বাঁধ-ভাঙা নদীর উত্তাল তরঙ্গের মতো ছুটে এসেছে শূদ্ররা যাদের নাম মুখে নিলেও এতকাল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পাপ হতো। যারা ছুটে এসে রথের রশি ধরেছে তারা কৃষক-শ্রমিক—তারা মেহনতী মানুষের দল। তারা রথের রশিতে হাত লাগাতেই আকাশ কাঁপানো শব্দে রথ ছুটেছে, রথ ছুটেছে ধনপতিদের ভাণ্ডারের দিকে, রথ ছুটেছে সৈনিকদের অস্ত্রশালার দিকে। কিন্তু রথ শেষপর্যন্ত পথ বদলেছে—চিরকালের বাপদাদার পথ নয়—পল্লীর কাঁচা পথ ধরে ছুটে চলেছে বুনো মোষের মতো।

পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন একদল নর-নারী, মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা অসাধ্য সাধনকারী (কিন্তু বর্তমানে কেবলই অনিষ্টকারী) পুরোহিত, সর্বকালদর্শী সন্ন্যাসী, অস্ত্রপ্রয়োগে পারদর্শী সৈনিক, ধনগর্বিত শেঠির দল, নব-জীবনের জয়গানে মুখরিত শূদ্র-দলপতি, সুবিধা-তাড়িত বুদ্ধিমান মন্ত্রী এবং সর্বকালের অসঙ্গতি-ঘোচানো ছন্দ মেলানো—চিন্তাশীল দার্শনিক ও মানবতাবাদী কবি, এরাই নাটিকায় ঠাঁই পেয়েছে।

মানুষে মানুষে বন্ধনের জোর আলগা হয়েছে বলেই পুরোহিতের মন্ত্রে আর কাজ হয় না। অথচ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ কালের বিবর্তনের সঙ্গে কোন পরিচয় না রেখে

পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের প্রতি দেখিয়েছে অগাধ বিশ্বাস আর ভক্তি। সে ভক্তিরসের ধারা মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধনকে সুদৃঢ় না করে ভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়েছে। ধর্মমূঢ়তার বেশ তাই কালের রথের রশিটাকে একশ্রেণীর নর-নারী কখনো মনে করেছে দাঁড়-নারায়ণ, দেবদড়ীশ্বর, যা দেখতে কখনো হনুমান প্রভুর লঙ্কা-পোড়ানো পবিত্র লেজখানার মতো' কখনো যমুনা নদীর ধারার মতো, কখনো গণেশ ঠাকুরের শুঁড়ের মতো। তাই পুরোহিতেরই এতকালের শিক্ষায় তারা তার উপর ঢেলেছে গঙ্গাজল, জেবলেছে পঞ্চপ্রদীপ। কিন্তু কালের রথ তাতেও নড়লো না প্রবিষ্ট হলো সৈন্যদল। তাদের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো।

তারপর ধনপতি শেঠির দলের প্রবেশ ধনিকের গর্বিত সংলাপ :
আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে—
জলে স্হলে আকাশে।

এ-সংলাপ আমাদের একালের পুঁজি পতিদের স্বরূপকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যারা মন্ত্রোচ্চারণ করে, যারা অস্ত্রচালনা করে, যারা সমাজে নীতিমালা আওড়ায় তাদের মাথা কিনে নেয় ধনপতি শেঠিরদল :

আজকাল চলছে যা-কিছু
সব ধনপতিদের হাতেই চলছে।

দ্বিতীয় ধনিকের এই গর্বোদ্ধত সংলাপ কিন্তু একসময় কালের যাত্রায় অসত্য বলে প্রমাণিত হলো। রথের রশি তাদের কাছে বিষম ভারী, বিষম আড়ষ্ট বলে মনে হলো।

তখন মহাকালের গতিধারার প্রয়োজনে ডাক পড়েছে শূদ্রের। এতকাল তারা ছিলো অস্পৃশ্য, অশুচি। এতকাল তাদের নাম মুখে আনলেও পাপ হতো। সেই অস্পৃশ্য অশুচি শূদ্রেরা এতকাল রথের চাকার তলায় পড়ে পিষ্ট হয়েছে। তাই শূদ্র দলপতি বলেছে :

এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়
দ'লে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপটা হয়ে।

কিন্তু মহাকালের ইশারায় এবারে তারা পেয়েছে রথের রশি ধরার অধিকার। কেন সে অধিকার তারা পেয়েছে তার কথা বলতে গিয়ে শূদ্র-দলপতি পুরোহিত-মন্ত্রী-সৈনিককে বলছে :

আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ—
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।

শেষপর্যন্ত পুরোহিতের চুহত্ন শাপকে উপেক্ষা ক'রে, সৈনিকের অস্ত্রের ঝনঝনানি ও রুদ্ররূপকে অবজ্ঞা ক'রে এবং বহুকাল প্রবাহিত সংস্কারের সাবধানবাণীর প্রতি কর্ণপাত না করে শূদ্ররা রথের রশিতে হাত লাগিয়েছে। চতুর ধনপতির দল তখন তাদের এতকালের শোষিত সম্পদ সামলাবার আপ্রাণ-প্রচেষ্টায় রত হলো। শূদ্রের টানে রথের গতি দেখে এতকাল যারা প্রভুত্ব করেছিলো, যারা তাদের শোষণ করেছে, সেই নিষ্ঠুর ও নির্মম প্রতারকের দল একেবারে হতভম্ব। সুচতুর মন্ত্রী শূদ্রদের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়িয়ে রশিতে টান দিতে যাবার আগে সবাইকে বুঝালেন :

ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।
স্পষ্ট গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন।
এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে।

বুদ্ধিমান মন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে তারা স্বাগত জানাতে পারলো না বুদ্ধি চাইলো কবির কাছ থেকে। দ্বিতীয় সৈনিক কবিকে বল্‌লো :

একী উলটো পালটা ব্যাপার, কবি !
পুরুতের হাতে চললো না রথ, রাজার হাতে না—
মানে বুঝলে কিছু ?

কবি জবাবে বলছে :

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
নীচের দিকে নামল না চোখ
রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানেনি
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে ল্যাজ আছড়াচ্ছে—
দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

পুরোহিতের মনে সংশয়। সে বললো :

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
তারাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবির জবাব ঃ

পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলারা সারাজীবন ধরে এত ভক্তি প্রদর্শন করেছে—তাই ক্ষোভে-দুঃখে তাদের মধ্যে দ্বিতীয়া বলছে :

ঘি ঢেলেছি, দুধ ঢেলেছি, ঢেলেছি গঙ্গাজল
রাস্তা এখনও কাদা হ'য়ে আছে।
পাতায় ফুলে ওখানটা গেছে পিছল হয়ে।

কবি বলছে ঃ

পুজো পড়েছে ধুলোয় ভক্তি করেছ মাটি।
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা, দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।

কবির সর্বশেষ এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংলাপ ঃ

তারপরে কোন-একযুগে কোন্-একদিন
আসবে উলটোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।
এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না ;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়োনা কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা একদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে ;
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একার মাথা তুলে।

॥ চার ॥

রবীন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন কিন্তু রাশিয়ার সকল মানুষের প্রভূত উন্নতিতে তিনি আত্মহারা হয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম তাই জমিদার-ব্যবসায়ে আমরা লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।"৭

বলাবাহুল্য এভাবে লজ্জা পেলেও তিনি কিন্তু মার্ক্সবাদী নন। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এক জায়গায় বলেছেন,

"মার্ক্সবাদ ও রুশ-প্রসঙ্গে পড়াশুনা তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) একটু সীমাবদ্ধ ছিল। লেনিন ও ট্রটস্কির রচনা অল্পসল্প পড়তে দেখেছি।...মনে হয়েছে মার্ক্সীয় দর্শনের বস্তুমুখিতা, ধনসাম্যের ভিত্তিতে নূতন বিশ্ব-বিধান গড়ার জন্য মার্ক্সপন্থীদের বৈপ্লবিক মনোভাব বা কমুানিস্ট রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক সমানাধিকারাত্মক সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মনে সুস্পষ্ট একটা নেতিভাব ছিল। এসব প্রসঙ্গের আলোচনা এলে তাই তিনি সাধারণত একটু উত্তেজিত হতেন।"৮

রবীন্দ্রনাথ নিজেই রাশিয়ার শিক্ষা ও অর্থনীতিক জীবনের অবিশ্বাস্য উন্নতি দেখে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি বিরুদ্ধ-মন্তব্যও তিনি করেছেন। তিনি বলেন,

"সোভিয়েট রাশিয়ার মার্ক্সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে এক ছাঁচে
"সোভিয়েট রাশিয়ার মার্ক্সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে এক ছাঁচে
ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অপবাদকে আমি সত্য বলে মনে করি।"৯

মার্ক্সীয় মতবাদের ঐতিহাসিক গতিধারা ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি অস্বীকার করেছেন। ১৯৪১ সালের মে মাসে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধে তার পরিচয় আছে।১০

'রথের রশি' নাটিকা নাট্যাকারে লেখা হলেও নাট্যগুণ এতে নেই বললেই চলে। কিংবা বলা চলে১১ এ নাটিকা যে পরিমাণে মতবাদে পরিপুষ্ট সে পরিমাণে শিল্পগর্ভা আদৌও নয়। নাট্যরীতিতে গ্রন্থিত হলেও এতে মতবাদ প্রচারের ইচ্ছাটাই উদগ্র।

আগেই বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সে-মতবাদ প্রকৃতপক্ষে মার্ক্সবাদ নয়। নেতিবাচক মনোভাবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তেই আছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো ; পুরাতন বিধি বিশ্বাসের শিকড়গুলোকে তার সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া ; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা। এরকম ভাঙনের উৎসাহে যে আবর্ত সৃষ্টি করে তার মাঝখানে পড়লে মানুষ তার খাটুনির আর অন্ত পায়না—স্পর্ধা বেড়ে ওঠে ; মানব প্রকৃতিতে সাধনা করে বশ করবার অপেক্ষা আছে একথা ভুলে যায় ; মনে করে তাকে তার আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা 'সীতাহরণ' ব্যাপার করে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তারপরে লঙ্কায় আগুন লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার তর সয়না যাদের তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে, অবশেষে লাঠিয়ে পিটিয়ে রাতারাতি যা গড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলে না, তার দীর্ঘকালের ভর সয় না।"১১

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে নাটিকা বর্ণিত কবির সংলাপের সাযুজ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য ঃ

পুরোহিত—রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।

কবি—আমরা মানি সুন্দরকে, তোমরা মানো কঠোরকে—অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে। বাইরে ঠেলা-মরার উপর বিশ্বাস ; অন্তরের তালমানের উপর নয়।

এবং সেই কারণেই কবির সংলাপে খুব জোরের সঙ্গে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত :

দেখো, কাল থেকেই শুরু করব চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

এখানেই মার্ক্সবাদের সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য :

বাইরে ঠেলা মারার উপর বিশ্বাস অন্তরের তালমানের উপর নয়।

বলাবাহুল্য উপরোক্ত দুটি লাইনের অন্তর্গত-সত্যের মধ্যেই রবীন্দ্র-মতবাদের স্বরূপ বহুলাংশে বিধৃত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ঐ মাতলামির দিনে আসবে উলটো রথের পালা। তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে 'বোঝাপড়া'—এই খাতও নির্দ্বন্দ্ব-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধ্যান-ধারনারই অন্তর্গত। তিনি মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির স্বরূপ অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি। তিনি ভারতীয়

জীবনের-অন্তর্গত-ঐশ্বর্যের ধারা লক্ষ্য করে তার ভেতর থেকেই সাম্যবাদী চিন্তার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব টেকে না ছাঁচ একদিন ফেটে চুরমার হবে, মানুষের মন তাতে একদিন কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে—এসব কথা তিনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন অনেক জায়গায়। কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাম্যবাদী চেতনার ধারাটিকে মার্ক্সবাদী চিন্তা ও চেতনার সঙ্গে মেলাননি তার সুস্পষ্ট কারণ তিনি নিজেই উল্লেখ করে বলেছেন :

"ভারতবর্ষের জীবন ও সংস্কৃতির একটা নিজস্ব ধারা আছে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে রাশিয়ার ছকে গড়ে তুলতে চাও তোমরা—আপত্তি করবো না, জিনিষটা গড়ে উঠলেই ভালো। কিন্তু কেবলমাত্র ধন-বণ্টনের সাম্যে বা ভোগ-উপভোগের সীমানা সর্বসাধারণের মধ্যে পূর্ণভাবে অবারিত করে দেওয়াতেই মানুষের চরম মুক্তি একথা আমি মানতে পারি না, মানুষের আত্মাকে জেনেছি বস্তুনিরপেক্ষ বলে, তার মুক্তি এতে নয়। সে কথা ভুলেছি বলেই মানুষের মুক্তি খুঁজতে বেরিয়েছি আমরা হানাহানির পথ ধরে।[১২]

মতবাদের এই মৌলিক ব্যবধানই 'রথের রশি' নাটিকাকে মার্ক্সবাদ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

পরিসিষ্ট

ঔপনিষদিক ভাবধারায় প্রভাবিত কবি রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন মানুষের মুক্তির কথা চিন্তা করতে গিয়ে অর্থনীতিক মুক্তির চেয়ে আত্মার মুক্তিকেই বড় করে দেখেছেন। তাঁর আত্মার সাধনার প্রসঙ্গটিকে তিনি শুধু সাহিত্যের চৌহদ্দীর মধ্যে সীমিত রাখেননি—ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সাধনার ফলশ্রুতিকে কাজে লাগাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন :

'ত্যাগ না করলে স্বাধীন হওয়া যায় না, যেটিকে ত্যাগ করব সেইটিই আমাদের বদ্ধ করে রাখবে—ত্যাগের দ্বারা আমরা মুক্ত হব'।[১৩]

এর থেকেই তাঁর 'আত্মার মুক্তি'র প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ হয়। সমাজজীবনে নিরন্ন-নিঃসহায় মানুষের মুক্তির কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক এই চিন্তার কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলেননি।

কিন্তু বাস্তবজীবনের আচরণ ও কর্ম পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর সাহিত্যকে মেলাতে গেলে স্ববিরোধিতা চোখে পড়বেই।

১৯৩০ সালে রাশিয়া পরিভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ যে-সব পত্র ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তাতে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতি তাঁর যেমন প্রবল অনুরাগ ও আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় তেমনি ঐ গ্রন্থের মধ্যেই বিরূপ কিছু সমালোচনাও চোখে পড়ে। অবশ্য সে সমস্ত মন্তব্য তিনি করেছেন ভারতীয় জীবনের প্রাচীন ধারা—যে জীবনধারা তার শক্তি সঞ্চয় করেছে উপনিষদের অমৃতময়বাণী থেকে—সেই প্রাচীন জীবন ও সংস্কৃতির মর্মমূলীয় সত্যকেই বড় করে দেখিয়েছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন :

"জমিদারি জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে।...তাই জমিদারি ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়।"

কিংবা অন্যত্র :

'বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়—আমরা যেন ট্রাসটির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাপ-পোশাক দাবি করতে পারব, কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মতো।'১৪

কিন্তু যিনি আত্মাকে বস্তুনিরপেক্ষ বলে মনে করেন, যিনি ত্যাগের মধ্যে আত্মার মুক্তি আছে বলে মনে করেন তিনি ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর জমিদারির একটি অংশও নিরন্ন জনগণের স্বার্থে দান করতে সম্মত হন না। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন :

"অমিয় চক্রবর্তী যখন তাঁর কাছে নিবেদন করেন যে যাবার আগে তিনি যেন তাঁর জমিদারি নেশনকে দান করে দিয়ে যান তখন তিনি (কবি) নারাজ হন।"১৫

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের অনেক জায়গায় নিজেকে সর্বহারা-নিরন্ন-নিঃসহায় মানুষের একজন বলে অভিহিত করেছেন। যেমন 'রাশিয়ার চিঠি'র একস্থানে বলেছেন : "আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের।"১৬

জমিদারি ব্যবসায়ের গ্লানিতে রবীন্দ্রনাথের কুণ্ঠা এবং অনুশোচনা, নিজেকে জমিদার হিসাবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ এবং নিজকে জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের একজন মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ—এতৎসত্ত্বে নিরন্ন নিঃসহায় মানুষের জন্য জমিদারি ত্যাগ করতে নারাজ হচ্ছেন (যদিও পরবর্তীকালে ইতিহাস সেই জমিদারি থেকে তাঁর পুত্রকে বঞ্চিত করেছে) ; বলাবাহুল্য এসব তাঁর স্ববিরোধী আচরণ থেকেই উদ্ভূত।

জমিদারি জীবনের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব এবং সদ্যবিকাশোন্মুখ পুঁজিবাদী সমাজের বুর্জোয়াচেতনা—এই দুইয়ের সংমিশ্রিত ধারা তাঁর জীবনের সমগ্র সত্তায় প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিজীবনের চিন্তা ও আচরণকে এই দ্বৈত-অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেজন্যে ত্যাগের দ্বারা জীবনের তথা আত্মার মুক্তি একথা বারংবার আওড়িয়েও

শেষ পর্যন্ত জমিদারির মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। সামন্ততান্ত্রিক চেতনার প্রাবল্যে তিনি সমাজে শ্রেণীভেদকে মেনে নিচ্ছেন কারণ তাতেই নাকি সমাজের ভারসাম্য বজায় থাকবে। এবং এসব কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে মানুষের আত্মাকে বস্তুনিরপেক্ষ বলে মনে করাতে সুবিধা অনেক তাই সামন্ততান্ত্রিক রবীন্দ্রনাথ খুব স্বাভাবিক কারণেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ঔপনিষদিক মন্ত্র সহযোগে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন। সমাংততান্ত্রিক জীবনের বিচিত্রবিধ বর্ণাঢ্যজট রবীন্দ্রনাথকে সমাজ-বিশ্লেষণে বিভ্রান্ত করেছে—শ্রেণীবিভক্ত সমাজ নিরন্তর শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে এই উপলব্ধির পরিচ্ছন্ন-স্বীকৃতি তাই তাঁর সাহিত্যের কোন অংশেই ফুটে ওঠেনি। সে প্রসঙ্গে বলা সঙ্গত যে 'রথের রশি' নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ সাম্যবাদী চেতনার যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণাইরই ফল। রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের ধ্যান-ধারণায় সামন্ততান্ত্রিক চেতনা বহুলাংশে (কিংবা হয়তো বলা যায় একেবারেই) অনুপস্থিত। বুর্জোয়া সমাজের আধুনিক জীবনের উদার মানবিকবাদ libural humanism রবীন্দ্রনাথের জীবনকে নানাভাবে প্রবাহিত করেছে। এ মানবিকবাদের ধারা শুধু ইউরোপ থেকে আসেনি—অনেক সভ্য দেশেই এর ধারা প্রবাহিত হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ মানবিকবাদের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় ধারার মর্মমূলীয় সত্যটিকে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন তাঁর জীবনের অনুভূতির বিরাট আয়তন।

কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর বুর্জোয়া জীবনের সুকঠিন মনোভাবের গণ্ডী পেরিয়ে বাইরের নিরন্ন নিঃসহায় মানুষের বেদনা-জর্জরিত জীবনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে চেয়েছেন তা কেবল তাঁর উদার মানবিকবাদের তিগ্ম অনুভূতির কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের জমিদারি জীবনের সচ্ছলতা শুধু নয় তাঁর কালের জীবনধারা বিশেষ করে তাঁর কালের উচ্চতর সমাজের সচ্ছল জীবনধারা নিরন্ন মানুষের দুঃখকে নিয়ে চিন্তা করার পথে অনেকখানি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে"—তখন রবীন্দ্রনাথের সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া চরিত্রের নিখুঁত চেহারাটা তাতে মুছে তো যায়ই না বরঞ্চ আরও স্পষ্টভাবে সেই চেহারা আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। কিন্ঠ নীচু তলায় এসে বসবার জন্য (কিয়ৎকালের নিমিত্ত হলেও) যে ব্যাকুলতা (শুধু ব্যাকুলতাটুকুই ছিলো, সমাজের নীচুতলায় তার মন কোনদিন বসেনি) তার প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করতে গেলেই তাঁর সেই উদার মানবিকবাদের কথাটাই এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটিকা কিংবা অন্যান্য কিছু কিছু কবিতার কথা যা আমি ইতিপূর্বে আমার আলোচনায় উল্লেখ করেছি তার সবগুলির জন্মই এই উদার মানবিক-বাদের প্রচণ্ড আবেগ থেকে। এই আবেগের প্রচণ্ডতাকে তিনি তাঁর সারা জীবনের সাহিত্য

সাধনার পরিসরে ধারণ করতে কিংবা লালন করতে সক্ষম হননি বলেই জীবনের বিভিন্ন স্তরে, অথবা বলা সঙ্গত যে সাহিত্য-জীবনের প্রায় সর্বস্তরেই, রোমান্টি-মিস্টিক ভাবালুতা জীবনের সুকঠিন বাস্তবতা থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

উদার মানবিকবাদের প্রচণ্ড এষণা থেকে রবীন্দ্রনাথ কখনও সাহিত্য-সত্যকে তাঁর জীবনসত্যের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁর সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তাঁর সাহিত্য ও জীবনকে একসঙ্গে মেলানো যায় না। মানবিকবাদের আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি মাঝে মাঝে নীচুতলার মানুষ সম্বন্ধে যেসব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে একাত্মতার সুর ধ্বনিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনাচরণের সঙ্গে তার কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। সেটা বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের আওতায় বসবাস করে সম্ভবও নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ করে তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন—তাঁর বাস্তব জীবনের সঙ্গে সে অনুভূতির কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা সেটা তাঁর কাছে নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। 'রথের রশি'র সমালোচনা করতে গিয়ে সেজন্য আমি তাঁর জীবনসত্যের বৃত্তে উক্ত নাটিকার ভাবসত্যকে টেনে আনিনি—অভিনব সৃষ্টি হিসাবে তার যেটুকু তাৎপর্য সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপকে অবারিত করে দিয়েছে শুধু সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁকে দেখার চেষ্টা করেছি। স্মর্তব্য যে তাঁর এ সৃষ্টি অভিনয় হলেও প্রবহমান কালের যাত্রার ধ্বনি তাতে যেটুকু শোনা যায় তা ঠিক বর্তমান কালের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শ্রেণীসংগ্রামের রূপটিকে ফুটিয়ে তুলে না। তার মধ্যে একধরনের সাম্যবাদী চেতনা কাজ করেছে কিন্তু তা মার্কস-লেনিনের সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ নয়। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে হলে এই কথা স্মরণ রাখা একান্তভাবে প্রয়োজন।

১. 'A Centenary Volume: Rabindranath Tagore 1861-1961 নামক A chronicle of Eighty years অধ্যায়ে এর উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে—'Composes the Poem Ebar Phirao Morey (Turn me away, now) which is a Call to his own self to turn away from a life of ease to a strenuous life of struggle dedicated to the service of humanity. The Provocation for writing this poem came from British high handedness in Africa (Zulu war).

২. 'রথের রশি' নাটিকার ভূমিকা-অংশে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একথা স্বীকার করেছেন।

৩. 'রাশিয়ার চিঠি' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৯৩১)। এর আগে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত পত্র ও প্রবন্ধাবলী প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের 'গ্রন্থ

পরিচয়' অংশে বলা হয়েছে :

"১৯৩০ সালের পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার রাশিয়ায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ; ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে রাশিয়া যাত্রার প্রস্তাব তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই ; অবশেষে ১৯৩০ সালে য়ুরোপ ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি হ্যারি টিম্বারস্, কুমারী মার্গট আইনস্টাইন, শ্রী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী আরিয়াম উইলিয়াম্স্ (আর্যনায়কম্) ও শ্রী অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে লইয়া রাশিয়া-দর্শনে যান এবং ১১ হইতে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদি পরিদর্শন করেন। এই পর্যটনের বিবরণ বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত Letters from Russia পুস্তকের পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ আছে।"

৪. রবীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি '('রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

৫. শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় চিঠি ('রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

৬. উক্ত সময়-সীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সমাজের সবচেয়ে নীচুতলার মানুষের দুঃখ-বেদনাকে সমগ্র-একটি-গ্রন্থের-ব্যাপ্তিতে টেনে আনেননি সত্য, কিন্তু মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস পূর্বে 'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থের দশম সংখ্যক কবিতায় অখ্যাত-অবজ্ঞাত-অবহেলিত মানুষের বেদনার কথা অন্তরঙ্গ-ভাবে উপলব্ধি করেছেন। যেমন সেখানে বলা হয়েছে :

> "কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
> কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
> যে আছে মাটির কাছাকাছি,
> সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

৭. ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। 'রাশিয়ার চিঠি'র শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৮. নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৯. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র—'উপসংহার' শিরোনামে 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে সন্নিবেশিত।

১০. উক্ত প্রবন্ধের একস্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এখনকার সমালোচকেরা যে বিস্তীর্ণ ইতিহাসের মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করেন তার মধ্যে অন্তত বারো-আনা পরিমাণ আমি জানিই নে। বোধ করি, সেইজন্যই আমার বিশেষ করে রাগ হয়। আমার মন বলে, দূর হোক গে তোমার ইতিহাস।' হাল ধরে আছে আমার সৃষ্টির তরীতে সেই আত্মা যার নিজের প্রকাশের জন্য পুত্রের স্নেহ প্রয়োজন, জগতের নানা দৃশ্য নানা সুখদুঃখকে যে আত্মসাৎ ক'রে বিচিত্র রচনার মধ্যে আনন্দ পায় ও আনন্দ বিতরণ করে। জীবনের ইতিহাসের সব কথা তো বলা হল না, কিন্তু সে ইতিহাস গৌণ। কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা-মানুষের আত্মপ্রকাশের কামনায়

এই দীর্ঘ যুগযুগান্তর তারা প্রবৃত্ত হয়েছে। সেইটিকেই বড় করে দেখো যে ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা-মানুষের সারথ্যে চলেছে বিরাটের মধ্যে—ইতিহাসের অতীতে সে মানবের আত্মার কেন্দ্রস্থলে। আমাদের উপনিষদ এ কথা জেনেছিল এবং সেই উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি সে আমিই করেছি, তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব।"

১১. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ('রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

১২. নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

১৩. রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৪. রবীন্দ্রনাথের ১৯৩০ সালের লেখা চিঠি 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

১৫. অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের 'তাঁর পরেই প্লাবন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৬. শ্রী প্রশান্ত মহলানবীশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় চিঠি ('রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)